Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.32-38
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আধুনিক কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য

বিনোদ কুমার আকুড়ে
Research Scholar, Dept. of Bengali, Tilka Maji Bhagalpur University

Abstract

Among the modern poets Subhash Mukhopadhyay emerged in the world of poetry with a prominent outlook and mentality. He has placed humanism above all with the communist ideology. The poet, who believed in the communist ideology, was immersed in the mantra of optimism. So a chapter of modern poetry has come to an end in Subhash Mukhopadhyay. Born at his uncle's house in Krishnanagar, the poet spent his childhood in Nebutala Lane. He spent the rest of his childhood in Naogaon, North Bengal. The poet Pakapaki came to Kolkata in 1930. In the 30's, a new turn began in the life of the poet. The poet became involved in political activities. As a result, studies remain incomplete. Politics starts from student life. He became a member of the Communist Party in 1942. The communist poet finally resigned from the party in 1981. He had his own religion with the poet Nazrul. This same shura has been heard in the writings of Sukanta Bhattacharya. The poet Subhash wanted to change the course of the struggle. In his poems, there is a conflict of style with ideology. He has promoted poetry. Used rhymes, fairy tales, and imagery. He did not give importance to sexuality. The poem 'Infantry' is his example. The footsteps of the spirit of mass liberation and mass struggle have been heard. He was the first poet he started his poetic life by writing political poems. The language of the common form has got the art form. In addition to poetry, prose, novels, travel stories, diaries and short essays, and magazine editing, the poet has translated poems by poets like Nazim Hikmat and Pablo Neduda. The only dream of the struggling poet was to bring a new era. Although the poet's oscillating scholarship worked, he did not miss the target. He is not a dreamer, he has fought against oppression and exploitation all his life. - Completing the evaluation of poet Subhas is a thing of the past. The poet, who was facing death at one time, said goodbye to us by presenting his thoughts and statements clearly. Even if he leaves, the humanist modern poet Subhash Mukhopadhyay will remain immortal in his artistry due to the quality of his creation.

Key Words: Emerged, Prominent,Humanism,Communist ideology, Sexuality, Exploitation

আধুনিক বাংলা কবিতায় দুই বিশ্বযুদ্ধকালীন মধ্যবর্তী সময়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত যে পর্বটি আরম্ভ হয়েছিল সেই পর্বের শেষ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আধুনিক কবিদের পথিকৃৎদের মধ্যে

জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীদের সঙ্গেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতা নিয়ে কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই সাম্যবাদী- 'পদাতিক' কবি যার সারাজীবনের কাব্যচর্চায় সাম্যবাদী আদর্শের সংগ্রাম ছাড়াও সবার উর্ধে স্থান পেয়েছে মানবতাবাদ। কবির চোখে ছিল লালফুলের পৃথিবীর স্বপ্ন। সেই কারণেই দুর্ভিক্ষ হোক বা জরুরী অবস্থায় মাইলের পর মাইল মিছিলে হেঁটেছেন, পায়ে পা মিলিয়েছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তাই প্রকৃত কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী কবি মানুষের শোষণ মুক্তির জন্য লিখলেন একের পর এক সাড়া জাগানো কবিতা। মানুষের উপর ছিল কবির অগভীর বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে কবি আশাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। জীবনের কোনো আদর্শের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। বার বার নিজের অনুভবকে ব্যক্ত করেছেন। তাই বলা হয় আধুনিক কবিতার একটা অধ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে এসে সমাপ্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে মামার বাড়িতে কবির জন্ম ১৯১৯ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি। কবির বাবার নাম শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মা হলেন শ্রীমতি যামিনী দেবী। কবির বাবার ছিল বদলির চাকুরি। তাই কবিকেও হতে হয়েছিল ভ্রাম্যমান। ছেলেবেলার প্রথম দিকটা কবির কেটেছিল কলকাতার ৫০নং নেবুতলা লেনে। একান্নবর্তী পরিবারে কবি বড় হয়েছেন। তাই কবি লিখেছেন- একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের স্নেহ, শাসন, আচার এবং ব্রত পালনের নানা আনন্দ। পারিবারিক অসচ্ছলতার মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছেন কবি। নেবুতলা লেনে কবির শৈশব কাটে-

> "হোস পাইপের গলা ফাটানো ঘোলা জলে রাস্তায় বানোকানোর শব্দ, বাঁশের চোঙ লাগানো চৌবাচ্চার কলকণ্ঠে সকালে প্রথম জল আসার আওয়াজ, গলির দরজায় বাড়িতে ডাকাত পড়ার মতো করে সাতসকালে ঠিকে ঝি'র জোরে জোরে কড়ানাড়া, কলকাতায় এঁটো বাসনের দিকে চোখ রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাশের বাড়ির কারনিশে বসা কাকের গলা চেরা-কা কা।"[১]

এইসব বিচিত্র ছবি ও শব্দের মধ্যে দিয়ে। এই নেবুতলা লেনেই কবির প্রথম পরিচয় ঘটে 'স্বদেশী ডাকাতদের সঙ্গে। কবির ছেলেবেলার বাকি অংশ কাটে উত্তর বাংলার নওগাঁয়। এই সময় বহু মানুষের সঙ্গে কবির মেলামেশার সুযোগ ঘটে। এই সময়ই কবি গান, বাজনা ও থিয়েটারের সঙ্গে পরিচিত হন। কবির ছেলেবেলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। নওগাঁ-তেই কবির পড়াশোনায় হাতেখড়ি। ১৯৩০ সালে বাবার চাকুরির বদলি হলে কবি পাকাপাকি ভাবে আসেন কলকাতায়। ক্লাস ফাইভে ভর্তি হলেন বউবাজার মেট্রোপলিটন স্কুলে। এই সময় মিটিং, মিছিলে পূর্ণ কলকাতার সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে। শৈশবেই কবির টাইফয়েড হয়। ফলে কবির চোখের দৃষ্টি, স্মৃতিশক্তি ও গানের গলা হারিয়ে যায়।

> "সেই এক ধাক্কায় তিনটি জিনিস হারাই
> গানের গলা, চোখের নজর আর স্মৃতিশক্তি।"[২]

ত্রিশের দশক থেকে কবির জীবনে শুরু হয় এক নতুন পালাবদল। এই সময় বিশ্বজোড়া মন্দার প্রভাবে তার পরিবারও আক্রান্ত হয়। ফলে কবির পরিবারের নতুন ঠিকানা হয় দক্ষিণ কলকাতার একটা ছোট্ট বাসাবাড়িতে। ভবানীপুর মিত্র স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় কবি শিক্ষক হিসাবে পেলেন কবি শেখর কালিদাস রায়কে; 'কালি ও কলম' পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে। কবি ১৯৩৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন-প্রথম বিভাগে। আই. এ.-তেও তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৯৪১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন কবি। ফলে পড়াশোনা আর

সম্পূর্ণ হয়নি কবির। ছাত্রজীবন থেকেই কবির রাজনীতির প্রতি ছিল গভীর আকর্ষণ। আই.এ. পড়ার সময় কবি সমর সেনের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে। সমরবাবুর দেওয়া 'হ্যাণ্ডবুক অফ মার্কসিজম' বইটির প্রভাবে কবি মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে কবি যোগদান করেন লেবারপার্টিতে। ঐ বছরেই কবি যোগ দেন কমিউনিস্টপার্টিতে এবং ১৯৪২ সালে লাভ করেন সদস্যপদ। ঐ বছরেই কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের যুগ্ম সম্পাদনার দায়িত্ব পান। প্রথমে 'জনযুদ্ধ' মুখপত্রে ও পরে 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকার সাংবাদিক। হিসাবে যোগদান করেন ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৮ সালে কবি কারাবরণ করেন, কমিউনিস্টপার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে। পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন ১৯৫১ সালে এবং ঐ বছরেই ১৭ই আগস্ট কবি গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। দুজনেই পরবর্তীকালে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে নিজেদের নিয়োজিত করেন। একসময় দলের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে কবি কমিউনিস্ট প্রভাব থেকে দূরে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮১ সালে কবি পার্টির সদস্য পদ ত্যাগ করেন। এরপর থেকেই নিজেকে একজন মানবতাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন আদন্ত এই কমিউনিস্ট কবি।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত কবি। তাঁর সময়ে ভেঙে যাচ্ছে পুরোনো সমাজ, কিন্তু তিনি অতীতের বিষণ্ণতাকে অতিক্রম করে গেছেন। সমাজের ভাঙনে খুশিই হয়েছিলেন কবি। তাই যারা নতুন সমাজ গড়ছে তাদের দেখে কবি আশান্বিত হয়েছিলেন। কবি বিষ্ণু দে এবং কবি সমর সেনের মানসিকতা থেকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এখানেই স্বতন্ত্রতা লাভ করেছেন। বিষ্ণু দে ছিলেন বুদ্ধিজীবী কবি। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ছিল কম। অন্যদিকে সাম্যবাদকে তিনি বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। সমর সেন সাম্যবাদকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কিন্তু প্রাচীনের প্রতি তার মোহ ছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার রাজনৈতিক জীবনেও সাম্যবাদকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মধ্যবিত্ত সমাজ এবং অনেকাংশে কৃষকদের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। এমন অনুমানও করা হয়। কবি নজরুলের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর স্বধর্ম ছিল। পরবর্তীকালে এই একই সুর শোনা গেছে সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রামের পথে সমাজে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন নবযুগের। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি পুরাতনের বিরুদ্ধে শাণিত ভঙ্গী ব্যবহার করলেও তার ভাবাদর্শের মধ্যে একটি স্বাভাবিক বিরোধ দেখা দিয়েছে। কারণ শুধু ব্যঙ্গের সাহায্যে পুরাতনকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর কবিতায় ভাবাদর্শের সঙ্গে শৈলীর বিরোধ হয়েছে, দেখা দিয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কখনো কবিতাকে প্রচারধর্মী করেছেন, কখনো ছড়া, রূপকথা, চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। লোক সাহিত্যের আঙ্গিক ব্যবহার করে জনসাধারণের সাথে যোগ সেতু গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি প্রকরণের ক্ষেত্রে ক্যানভাসার', 'বাজিকর" ইত্যাদি ভঙ্গী ব্যবহার করে কবিতাকে সহজবোধ্য করে তুলেছিলেন। সাতটি ভাই পাহারা দেয়/পারুল বোন আমার[৩] অথবা 'পূর্ব দখিনে আগুন বোনা/সাত সাগরের ঝি'[৪],কিংবা 'এক যে ছিল রাজা/ রাজত্বটা মস্ত[৫]-প্রভৃতি কবিতা রচনা করে। রূপকথার আমেজ নিয়ে এসেছেন। সুভাষের 'কালমধুমাস', খেলা দেখে যান'-প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে 'ক্যানভাসার, 'বাজিকর'-এর ভঙ্গী পাওয়া যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহারের পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি, যা করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। এখানেই কবি সুভাষের স্বাতন্ত্র্য।।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাম্যবাদের আদর্শে যৌনতাবাদকে গুরুত্ব দেননি। কারণ সাম্যবাদের পথে তা বাধা স্বরূপ। যদিও যৌনতাবাদ আধুনিক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যৌনতাবাদ ছদ্মবেশে কখনো কখনো প্রকাশিত হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ-পদাতিক' ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। এই প্রথম

কাব্যেই তিনি তার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটালেন, তার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখলেন। আলোচ্য কাব্যে শোনা গেল কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর। সাধারণ আটপৌরে বা সাদামাটা কথ্যভাষাকে অসাধারণ শিল্প সুলভ দক্ষতায় তিনি কবিতার মধ্যে সংযোজন করলেন। পদাতিক' তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। গণমুক্তি ও গণসংগ্রাম চেতনার পদধ্বনি শোনা গেছে-'পদাতিক' -এ।

কবি এই কারণেই স্বাতন্ত্র্য-কারণ তিনি যখন 'পদাতিক' লিখলেন তখন তিনি তারুণ্যে উজ্জ্বল, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি আর পাঁচজন তরুণ কবির মত লিখতে পারতেন প্রেমের কবিতা। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তার বদলে লিখলেন সমস্ত কিছুর অন্যায়-অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্য কবিতা। তাই সামগ্রিকভাবে মুক্তির জন জেহাদ ঘোষণা করলেন। এখানেই তার স্বাতন্ত্র্যতা। যেমন-

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল খাদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।" (পদাতিক)।

এই ছন্দবদ্ধ স্পষ্ট উচ্চারণ সে সময়ের পাঠক সমাজের মনকে আলোড়িত করে তোলে। কবি বার বার কবিতার শুদ্ধতার সম্মান করেছেন। সাধারণ মুখের ভাষাকে শিল্প সম্মতভাবে রূপান্তরিত করেছেন কবিতার ভাষায়। গদ্য কবিতাতেও তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পুরোনো বিশ্বাস, পুরোনো সম্পর্ককে নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, -

"পুরোনো ভিত গুলো যখন বালির
মত ভাঙছে,
আমরা ভাই বন্ধুরা
ঠিক তখনই
ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছি।"

'পদাতিক' ১৯৪০ খ্রিঃ, ছাড়াও কবি অজস্র কবিতা ও কাব্য সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮খ্রিঃ), "চিরকুট' (১৯৫০খ্রিঃ), 'ফুলফুটুক' (১৯৫৭ খ্রিঃ), 'যত দূরেই যাই'(১৯৬২খ্রিঃ), 'কাল মধুমাস'(১৯৬৬খ্রিঃ), 'এই ভাই' (১৯৭১খ্রিঃ), 'ছেলে গেছে বনে (১৯৭২খ্রিঃ), 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯খ্রিঃ), 'জল সইতে'(১৯৮১খ্রিঃ), 'চই চই চই' (১৯৮৩খ্রিঃ), 'বান ডেকেছিল'(১৯৮৫খ্রিঃ), 'যা রে কাগজের নৌকা' (১৯৮৯খ্রিঃ), ধর্মের কল' (১৯৯১খ্রিঃ), একবার বিদায় দে মা (১৯৯৫খ্রিঃ), 'ছড়ানো পুঁটি' (২০০০খ্রিঃ) প্রভৃতি।

কবিতা ছাড়াও রয়েছে কবির গদ্য রচনা। তার মধ্যে উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরী ও লঘু রচনা উল্লেখযোগ্য। পত্র পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও কবি অনুবাদ করেছেন, নাজিম হিকমত', 'হাফিজ', 'পাবলো নেরুদা' প্রভৃতি। কবিতা সম্পর্কিত গ্রন্থ-'টানাপোড়েনের মাঝখানে' ও 'কবিতার বোঝাপড়া' উল্লেখের দাবি রাখে।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে অন্য এক পালাবদল শুরু হয়-তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের কবিতা অনুবাদ করার সময় (১৯৫২খ্রিঃ)। কবি প্রেম ও নারী সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিন্তু তা থেকে নিজেকে দূরে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কবি মনে করতেন প্রেম বা নারী রাজনৈতিক জীবনের কার্যাবলীর

পথে বাধা স্বরূপ। তাই কবির ভাষায়,-"জীবনের যে সময়টাকে বলা যেতে পারে রোমান্টিক পিরিয়ড' অর্থাৎ সেই সময়ে ব্যক্তি জীবনে নারীকে নিয়ে ভাবার, কল্পনা করার অথবা নারী সঙ্গ পাওয়ার, সেই সময়টাই রাজনৈতিক জীবনের তাগিদে নারী সঙ্গ এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতাম। প্রেম করে সময় নষ্ট করার সময় নেই, এটাই ভাবতাম।"[৬]

আসলে প্রেম বা নারীর চেয়ে কবির কাছে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল রাজনীতি। সংগ্রামী কবির একটাই স্বপ্ন ছিল-নবযুগ আনার। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়েছে কিন্তু কবির কাজ থেমে থাকেনি। আশাবাদী কবি অন্ধকারের মধ্যেই সূর্যকে দেখতে পেয়েছেন। তাই বলেছেন- "পোড়া মাঠে মাঠে বসন্ত ওঠে জেগে"[৭]। এই সময় তার জীবনে দোলাচল বৃত্তি কাজ করতে থাকে। একদিকে তার প্রেমিক সত্তা, অন্যদিকে বিপ্লবী মনোভাব। উদাহরণ হিসাবে জেলখানার চিঠি'কবিতার কথা বলা যায়। শেষপর্যন্ত রাজনীতিকে ভালোবেসে সরাসরি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন-"প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য"(যে দিনের কবিতা)। কবি চেয়েছিলেন "কবিতা দিয়ে মানুষের হাত গুলোকে এমনভাবে কাজে লাগাতে, যাতে দুনিয়াটা মনের মত করে আমরা বদলে দিতে পারি।"[৮]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাম্যবাদ গ্রহণ করেছিলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিক থেকে। কবি বিষ্ণু দে যে সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন কবি সুভাষ তা পারেননি। কবির রক্ত, সংঘর্ষের মুহূর্তগুলি যত দূরেই যাই', 'কালমধুমাস- প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অন্ধকার দেখেও কবি আসা করলেন,- "ভোর হবে তাই এত অন্ধকার ব্যথায় মোচরায়"।[৯] কবি সুভাষের জন্ম মাঘ সংক্রান্তিতে। তাই শীতের শেষে নিজের জন্ম সূত্রে পাওয়া স্থির বিশ্বাসের ভরসা কবচের মত তাকে রক্ষা করেছে। আর তাই তিনি জেনেছেন, 'কালমধুমাস'। কবির 'যত দূরেই যাই কাব্যগ্রন্থে নানা প্রকার চিত্রকল্পের ব্যবহার হয়েছে। দেশলাই, ল্যাম্পপোস্ট, ছেড়া চাটাই প্রভৃতি নানা প্রকার চিত্রকল্প ব্যবহার হয়েছে। ঐ চিত্রকল্পগুলি প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ রূপে সাম্যবাদের ধারণা থেকে মুক্তি পাননি। কবি যে সমাজে কাজ করেন সেখানে তিনি স্বপ্ন বিলাসী নন। সেই কারণেই কবি বোঝেন-মাটির জমি চাষের মত মনের জমিও চাষ করা প্রয়োজন। তাই ট্রাক্টর চালানোই শুধু নয়, কলম চালানোও তাঁর উদ্দেশ্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য একটি বিশ্বাসের তুলনায় কবি মনের জিদ বেশি প্রকাশিত হয়েছে। যে বিষয়টি তার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল সেটি আসতে আসতে শিথিল হয়ে গেছে আর তিনি বুঝেছেন-মৃত্যু যত বড়ই হোক জীবনের চেয়ে তা বড় নয়। তাই গোটা একটা জীবন ধরে আনার জন্য তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি। আর সেই জন্য তিনি যুক্তি দিয়ে মেনেছেন নতুন পৃথিবী, অজস্রমুখ, সীমাহীন ভালোবাসা ইত্যাদির জন্য কবিতা রচনা করা প্রয়োজন। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণার মনোভঙ্গী সুভাষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম বিষয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় কোথাও কোথাও দার্শনিকতার স্পর্শও আছে। ফুলফুটুক'-তে যেমন অনিশ্চয়তার ভাব আছে তেমনি 'যত দূরেই যাই'-তে হতাশার করুণ দিকটি ফুটে উঠেছে। পদাতিক কিংবা 'চিরকুট' রচনার যুগে তিনি স্বপ্ন, মায়া প্রভৃতির প্রতি সন্দেহ প্রকশ করেছেন। আর খানিকটা আশা ভঙ্গের বেদনাও সেখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে বারবার বিবর্তন দেখা দিয়েছে। যৌনতাবাদকে গুরুত্ব দেননি আবার মগ্ন চৈতন্যের রহস্যেও নিজেকে বেঁধে রাখেননি। কবি নজরুলের মত আবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে বৈদগ্ধকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল কবিতার গঠন। তার কবিতাকে খুঁজে পাওয়া যায় সাবলীল শব্দ ও ছন্দের ব্যবহারে, দৈনন্দিন ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে। কবি জীবনকে দেখেছেন নিখুঁত ভাবে খুঁটিয়ে একটু বাঁকা ভঙ্গীতে। জীবনকে মেলে ধরেছেন-সহজ-সরল ভঙ্গিতে-আবেগ ও ভাবনাকে সামান্য দূরে সরিয়ে অনেকটা ফলধারার ন্যায়। নিজেকে মেলে ধরার সহজ ভঙ্গিমার প্রকাশ লক্ষ্য কার যায় তার কবিতায়।

সেই কারণেই সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ বা বুদ্ধদেব বসুর কবিতার সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কবির নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে মেলামেশার আত্মিক সম্পর্ক কবিতা রচনায় অনেকখানি ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চারপাশের জীবনকে যে দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন, লোকমুখের এক একটি শব্দ যে ভাবে কবিতায় পরিবেশন করেছেন তা এক অর্থে অসাধারণ।

পার্টি-কর্মী ও কবির মধ্যে দূরত্ব রেখে নয়, ভাবের ধোঁয়াশায় 'সিয়েট' মূর্তি হয়ে নয়, সহজ সত্য স্পষ্টবাদীতায় এবং অকপট আত্মপ্রকাশেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব। কথা বলার রীতিতে কবিতা লেখার এমন সুনিপুণ সার্থক কারুকলা আর দ্বিতীয় জনের মধ্যে দেখা যাবে না।

কবি সুভাষের মূল্যায়ণ সম্পূর্ণ করা সাধারণের অতীত। এক সময় মৃত্যুর মুখোমুখি কবি তার ভাবনা ও বক্তব্যকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরে বিদায় নিয়েছেন ২০০৩ সালের ৮ই জুলাই। তিনি চলে গেলেও আমরা দেখেছি যে ভাবনা নিয়ে কবি পথ চলা শুরু করেছিলেন, ফুল ও আগুনকে হাতিয়ার করে নবযুগের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বারবার নতুন কবিতা লেখার আয়োজন ছিল যার শিল্পী সত্তায় সেই মানবতাবাদী আধুনিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন নিজ সৃষ্টির গুণে।

উল্লেখ পঞ্জি –

১) কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়,-ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন' (১৯৮৭/অরুণা প্রকাশনী) 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ঃ জীবন ও সাহিত্য; সম্পাদনা : সন্দীপ দত্ত, পৃষ্ঠা-২১১, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী-১৯৯৬, মুদ্রকঃ ডি এণ্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, কলকাতা-১৩২।
২) সন্দীপ দত্ত- সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও জীবন ও সাহিত্য; পৃষ্ঠা-২১২। প্রথম প্রকাশ ৪ জানুয়ারী, ১৯৯৬। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রকাশ ৪ জানুয়ারী, ২০১২ মুদ্রকঃ ডি এ্যাণ্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, কলকাতা-৭০০১৩২।
৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবিতা-পারুল বোন', 'ফুলফুটুক' কাব্যগ্রন্থ।
৪) সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ছড়া- 'দিয়েন বিয়েন ফু।
৫) সুভাষ মুখোপাধ্যায় , কবিতা-এক যে ছিল।
৬) "দৈনিক বর্তমান চতুষ্পণী/ ২৬শে মে, ১৯৯২।

৭) সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠকবিতা,কবিতা-অগ্নিকোণ', কাব্য 'অগ্নিকোণ' ত্রয়োদশ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-৩৬।
৮) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ঃ কবিতা কেন লিখি ও লিখি না, দেশ পত্রিকা, ২৭শে মে, পৃ-৫৪।
৯) সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠকবিতা, কাব্য কালমধুমাস' এয়োদশ সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-৯১।